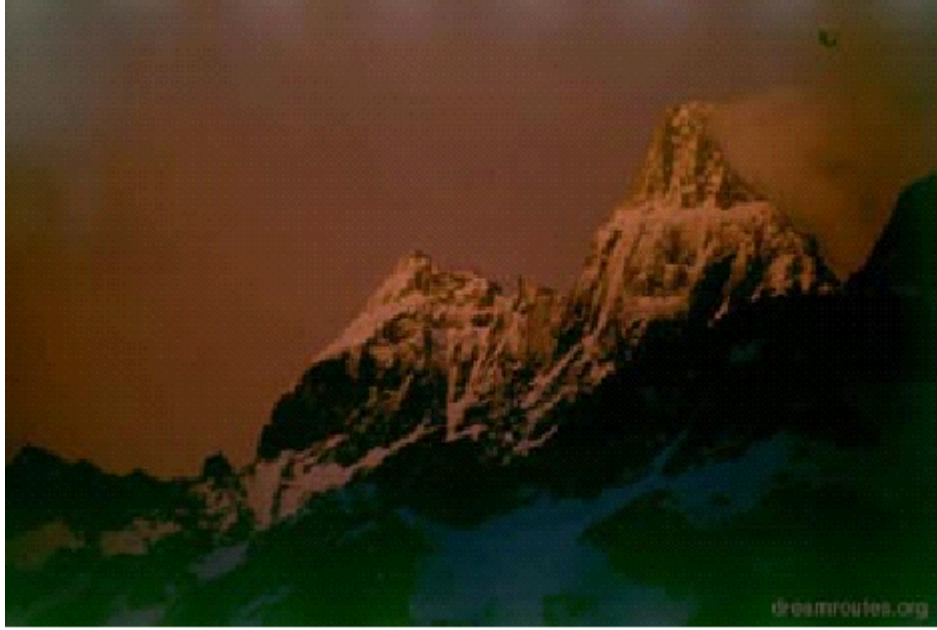


পার্বতী উপত্যকা

সজল খালেদ

(মুক্ত-মনার নতুন ওয়েব-সাইটের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে লিখিত)

ভারত সরকারের যুব-মন্ত্রণালয় প্রতিবছর হিমালয়ে কয়েকটি 'ট্র্যাকিং ও ক্লাইম্বিং'এর আয়োজন করে থাকে। সরকারি ব্যবস্থায়ন এবং পর্যাপ্ত সেচ্ছাসেবীদের কারণে এরকম যাত্রার খরচ খুবই কম হয়। শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই যথাযথ চিকিৎসক দিয়ে শারীরিক যোগ্যতার অনুমোদনসহ আবেদন করতে পারে। আবেদন করতে হয় প্রায় তিন মাস আগে। আমি তখন পরাশোনার সুবাদে দক্ষিণ ভারতে, এরকম আয়োজনের কথা একজায়গায় পড়ার পরেই অস্থির হয়ে উঠলাম বাংলাদেশি হিসাবে যোগদানের সম্ভবনা জানার জন্য। দিল্লির যুব-মন্ত্রণালয়ে ফোন করে জানা গেল যে তিনবছর ধরে ভারতে অবস্থানকারী যেকোন বিদেশী নাগরিক এখানে আবেদন করতে পারে।



যে ট্রেইলটি পছন্দ করলাম সেটি হিমাচল প্রদেশের পার্বতী উপত্যকায়, এর জন্য আবেদন করার আগে ৩ বছরের ট্র্যাকিং অভিজ্ঞতা এবং কমপক্ষে ১২০০০ ফিট আরোহনের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সেসব না থাকলেও সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র অভাব ছিলো না। ছেলেবেলা থেকে চুরান্ত কঠিন স্পোর্টস'এর সাথে জড়িত থাকার কারণে শারীরিক দক্ষতা নিয়ে আমি সবসময়েই আস্থাশীল, এইসব ভেবেচিন্তে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকলেও সেটা বেমালাম চেপে গিয়ে যোগদানের প্রায় চারমাস আগেই প্রয়োজনীয় টাকাসহ আবেদন করলাম।

আমার ইচ্ছা দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে বাংলাদেশে যাবার। দক্ষিণ ভারতের বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভারতত্যাগের অনুমতি দেয়া হতো মাত্র তিনদিন আগে, কাজেই বাড়ি ফেরার সময় ইচ্ছা থাকলেও কোথাও দেরি করার উপায় ছিলো না। কিছুদিন আগেই আমার এক সহপাঠীর লাল পাসপোর্টধারী বাবা তার পুত্রের জন্য এক সপ্তাহ সময় হাতে নিয়ে দেশত্যাগের অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কাজেই আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা ছিলো যে, আমাকে তিন সপ্তাহের সময়সহ

দেশত্যাগের অনুমতি না দিলে আমাকে অতিরিক্ত প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করতে হতে পারে। কিন্তু ভীষণ উচ্ছাসিত হলাম এই দেখে যে ট্র্যাকিং'এর সরকারি অনুমতি বিবেচনা করে চাহিদানুযায়ী আমাকে বিশেষ অনুমতি দেয়া হলো।

আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা বেশ দীর্ঘ। আমার এক বন্ধু মন্তব্য করলো এই বলে যে আমার সর্পপ্রবৃত্তি আছে, সেজন্যই আমি সাপের মতো একে বেকে গন্তব্যে যেতে চাই। ব্যাঙ্গালোর থেকে যাত্রা শুরু করে চণ্ডিগর - জয়পুর - আজমীর - পুষ্কার - আগ্রা - দিল্লী - ফতেপুর সিক্রি - সিমলা - কুলু হয়ে আমার গন্তব্য কাসোল। কাসোলেই আমাদের বেইস ক্যাম্প। প্রতিটি জায়গার প্রায় সব দ্রষ্টব্য ঘুরে দেখেছি আর রাত্রি যাপন করেছি ইয়ুথ হস্টেলে অথবা যানবাহনে। হোটেলের ভাড়া বাঁচানোর জন্য আমি প্রায় সময়ই সারাদিন কোন দ্রষ্টব্য স্থান দেখে রাতের বাস বা ট্রেন ধরে পরবর্তী গন্তব্যে চলে যাই, রাতের ঘুমটা চলতে চলতেই সেরে নেই।

একাকি দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাস্তায় নামবার সময় প্রতিবারই কিছু বিশেষ অনুভূতি হয়। বিশেষ পোষাক, ভারী রুকস্যাক, ক্যামেরার ব্যাগ, বেইসবল ক্যাপ, রোদচশমা, প্রতিটি পদক্ষেপ, হাজারো নতুন মানুষ, অজানা অভিজ্ঞতার হাতছানি, অনিশ্চয়তা.....সবকিছু মিলে কেমন যেন একটা বিশেষ রসায়ন ঘটে মনের মাঝে।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা নিয়ে একসময় কুলু এসে পৌছালাম। কুলু থেকে লোকাল বাসে কাসোল যাবার সময় পরিচয় হলো আমাদেরই অভিযানের নাসিক থেকে আসা দুই যুবক সামীর এবং ভরত'এর সঙ্গে। হিমাচল প্রদেশের মেয়েরা খুব সুন্দরী হয়ে থাকে, তেমনই এক সুন্দরীর পাশে বসা নিয়ে ওদের মাঝের খুনসুটি খুব মজা লাগছিল। কাসোল দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। এখানের সিংহভাগ মানুষই ইউরোপীয়ান, রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে জার্মান, ইতালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ খাবারপ্রাপ্তির সাইনবোর্ড চোখে পরে। খুব সস্তা হোটেলে ইউরোপীয়ান যুবক যুবতির মােসের পর মােস থেকে যায়, সঙ্গে থাকে বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্র। কাসোল'এর খুব পরিচিত দৃশ্য হলো একজন ভাবুক চেহারার জটাধারী হিমালয়-সন্যাসী ইংলিশ'এ উচ্চমার্গীয় কথাবার্তা বলছে আর পাশে গোল হয়ে বসে তা শুনছে কয়েকজন ইউরোপীয়ান, সঙ্গে অবসম্ভাবী অনুঘটক হিসাবে সবার হাতে ঘুরছে একটি ধূমায়িত গাঁজার কলকি। এখানকার অনেক পর্যটকই শুনেছি ভিসা এবং টাকা দুটোই শেষ হয়ে গেলে স্থানীয় কাউকে বিয়ে করে আরো বছরখানেক বসবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়। কবি, প্রেমিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নেশারু, ফুর্তিবাজ এবং অকর্মীদের জন্য কাসোলের চেয়ে বড় স্বর্গ আমার এখনো চোখে পড়েনি।

আমরা তিনজন অনেকটা ঘুরপথে বেইস ক্যাম্প এসে বেশ চমকে গেলাম, মনে হলো যেন কোন মিলিটারি ক্যাম্পে চলে এসেছি। অভ্যর্থনায় ত্রুটি না থাকলেও নিয়মকানুনের বেশ কড়াকড়ি, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দুটো কম্বল রুকস্যাকে ভরে ২০ মিনিট দৌড়অথা ৫০ টা বুকডন দেবার শাস্তি মুহূর্মুহ চোখে পরছে। রাতে শোবার আগে আমাকেও তুচ্ছ একটা কারণে একটু গা গরম করে ঘুমাতে হয়েছিল সেদিন

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৫ জন আজ এখানে জড়ো হয়েছে, প্রায় সবাই'ই ছোট ছোট দলবেঁধে এসেছে। সবচাইতে বড় দল নাগপুরের, তারপর হায়দ্রাবাদ এবং ওরিশা'র। আমাদের দলের চমক হিসাবে আছেন সন্তরোধ আলোকচিত্রী পর্বতারোহী বোসের চাঁন সাহেব, যিনি গত ৩০ বছর থেকে নিয়মিত হিমালয়ে পর্বতারোহণ করছেন। অনুমোদন কমিটি বেশ কয়েকবছর থেকেই স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁকে অনুমোদন দিতে আপত্তি জানিয়ে আসছে কিন্তু চাঁন সাহেব প্রতিবারই কোন না কোনভাবে অনুমোদন আদায় করে নিচ্ছেন। যাত্রা শুরুর পরে তিনি আমাদের জানালেন যে তিনি প্রতিবছর পর্বতারোহণে আসেন কারণ তিনি হিমালয়ের বুকেই মরতে চান। শুনে আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। বৃদ্ধ শান্তিতে হিমালয়ের বুকে মারা গেলে বহন করার দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়েই পড়বে এই ভেবেই ভয় পেয়েছিলাম।

আমাদের দলটাকে অনেকদিক থেকেই খুব চৌকস মনে হচ্ছিল, হাতে গনা কয়েকজন ছাড়া প্রায় সবাই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। আমাদের দলপতি একজন স্কুল শিক্ষক যিনি ২০ বছর ধরে নিয়মিত হিমালয়ে আসছেন, আগেও তিনি এই ট্রেইলে তিনবার ট্র্যাকিং করেছেন। দলে লিঙ্গভেদে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, ফরেস্ট অফিসার, ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, কবি, ব্যবসায়ীসহ বহুবিধ পেশার মানুষ রয়েছেন। সবচেয়ে মজার বাপার হল যাত্রা শুরু করার সময় থেকেই কথা থেকে একটি বড়সড় হিমালয় কুকুর আমাদের সাথে যোগ দিলো। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম বাবুভাই। অভিজ্ঞ বাবুভাই পুরোটা পথই আমাদের আগলে রেখেছিল। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ'এর সুপরিচিত পর্বতারোহী আলকচিট্রী সুহৃদ বাবু ভাই'এর সাথে পরিচয়ের আগেই আমি এই অভিযানে গিয়েছিলাম, কাজেই এখানে যোগসূত্র খুজে সুবিধা করা যাবে না।

প্রথমেই আমাদের যার যার বরাদ্দ তাবু দেখিয়ে দিয়ে সঙ্গে নেবার জিনিষপত্র পরীক্ষা করা হলো। অনেকেই কানঢাকা গরম টুপি, গরম হাতমোজা, রোদচশমা অথবা সঠিক ট্র্যাকিং জুতো আনেনি, তাঁদেরকে তারাছরো করে নিকটস্থ শহরের ট্র্যাকিং সরঞ্জামের দোকান থেকে তা কিনে আনতে হলো। সঙ্গে নেবার প্রতিটি জিনিষই অনুমোদন করিয়ে নিতে হচ্ছিল প্রশিক্ষকের কাছ থেকে। প্রশিক্ষক নিষিদ্ধ ঘোষণা করছিলেন ওয়াকম্যান, বইসহ অন্যান্য যা তাঁর কাছে শৌখিন মনে হচ্ছিল সেসব। প্রথমদিন হাসিঠাট্টা করতে করতেই কেটে গেল। এই কিছুদিন আগেও দিল্লী আর জয়পুরের কাঠফাটা গরম থেকে এসে এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা, তাপমাত্রার বৈচিত্রে আমার দাঁতের ধাতব ফিলিং খুলে না যায় সেই আশঙ্কায় আছি। বেইস ক্যাম্প সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ ফিট উঁচু তিনদিক থেকেই বিশাল সব পর্বত আমাদের ঘিরে রেখেছে। সামনের পর্বতটি ৯০০০ ফিট উঁচু, আমাদের যাত্রা শুরু হবে একে অতিক্রম করে। বিকালে ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যে আমাদের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো। শহরায়ন বিরুদ্ধমনা দিল্লীর এক ভদ্রমহিলা আমাদের উচ্চতাজনিত অসুখের প্রকারভেদ, বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখাসহ এধরনের যাত্রার মৌলিক কৌশলসমূহ বর্ণনা করলেন চমৎকারভাবে। অসাম্প্রদায়িক পরিবেশের সহায়ক হিসাবে পুরো যাত্রাপথে এবং বেইস ক্যাম্প'এ ইংলিশ এবং হিন্দি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথপোকথন নিষেধ করা হলো। সবশেষে বেইস ক্যাম্পের চমৎকার নিরামিষ রান্না খেয়ে আমরা যার যার নির্দিষ্ট স্লিপিং ব্যাগ'এ ঢুকলাম। আমার কাছে স্লিপিং ব্যাগকে সবচেয়ে দরকারী জীবন রক্ষাকারী জিনিস মনে হয়। এরকম অভিযানে কারো কাছ থেকে স্লিপিং ব্যাগ কেড়ে নিলে তাঁর বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

পরদিন ভোরে আমাদের ব্যায়াম করাতে নিয়ে গেলেন এক ষাটোর্ধ প্রবীন। কেউ কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এই আশঙ্কাতেই বোধহয় তিনি প্রথমেই দলের তাগড়া এক 'যুবক'কে পাশে নিয়ে একই সাথে চিন-আপ দেয়া শুরু করলেন। 'যুবক' দশের পর থেমে গেলেও প্রশিক্ষক ভদ্রলোক পুরো বিশটি চিন-আপ দিয়ে থামলেন। আমাদের পর্বতারোহীদের জন্য বিশেষ ব্যায়াম শিখিয়ে দেয়া হলো যা আমাদের পরবর্তী দিনগুলোতে নিয়মিত করতে হয়েছে।

ব্যায়ামের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ৭৫০০ ফিট উঁচু একটি পাহাড়ে অনুশীলন'এর জন্য। দুপুরের বিরতির পর সবাই একেকজন করে নিজের সম্পর্কে মিনিট পাঁচেক বলল, কে কি করে, কি শখ, কতদিন ধরে ট্র্যাকিং করছে এইসব। ট্রেইনার ভদ্রলোক বেশ আবেগঘন একটি বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। তিনি সরকারি চাকরি করেন, বছরে যা ছুটি পান তা পরিবারের সাথে ব্যয় না করে আমাদের সাথে ব্যয় করেন বলে বেশ একটু সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু আমরা এরপর থেকে তাঁকে পরিবার পরিজন নিয়েই ক্যাম্পে যোগ দিতে পরামর্শ দিলাম। সন্ধ্যায় ফিরে এসে ক্যাম্প ফায়ারের সাথে সাথেই আবারো সেই তাত্ত্বিক প্রশিক্ষন, আজ প্রশিক্ষনে আছেন সেই প্রবীন যুবক। তিনি হিমালয়ে তাঁর বিভিন্ন কঠিন অভিজ্ঞতা আমাদের শোনালেন।

পরদিন ভোরে ব্যায়ামের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রক ক্লাইম্বিং'এর একটি প্রশিক্ষনে। এখন ইউরোপে কয়েকবছর রক ক্লাইম্বিং করার পরে বুঝি সেদিনকার সেই ক্লাইম্বিং নিছক ছেলেমানুষী ক্লাইম্বিং ছিলো, কাঠিন্যের মাপকাঠিতেও তা ৩'এর বেশি হবে না। রক ক্লাইম্বিং'এর

পর আমাদের র‍্যাফটিং করে ৪৫ ডিগ্রী একটি উঁচু পাহাড় থেকে নামানো হলো। র‍্যাফটিং ব্যাপারটি বেশ মজার যদিও পরবর্তীতে আমার একে অহেতুক বিপদজনক মনে হয়েছে। আনুমানিক ৪৫ ডিগ্রী পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি ক্লাইম্বিং দড়ি বুলিয়ে সেটি নিজের কোমড়ের দুদিকে পেঁচিয়ে শুধুমাত্র দুহাতে দড়িটি চেপে নিচের দিকে মুখ করে নিজের শরীরকে ৪৫ ডিগ্রী নিচের দিকে হেলিয়ে পাহাড়ের সাথে ৯০ ডিগ্রী খাড়া হয়ে হেঁটে আসাকে বলা হয় র‍্যাফটিং। এর পর বিকালে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো নদী পার হবার কৌশল শেখাতে। একজন কোমড়ে ক্লাইম্বিং দড়ি বেঁধে সাঁতরে নদী পার হয়ে দড়িটি একটি গাছে বেঁধে দিল আর বাকি সবাই দড়িটি টেনে শক্তভাবে এইপাড়ে বাঁধলাম। এরপর ছোট দড়ি দিয়ে বেলট বানিয়ে সেটি কোমড়ে পরে একটি ক্যারাবিনা দিয়ে বাঁধা দড়ির সাথে আটকে একে একে বুলে নদী পার হলাম। অনেকবছর পরে আল্পস'এ এভাবেই একটি চূড়া থেকে আরেকটি চূড়াতে ক্যামেরার ব্যাগ এবং রুকস্যাকসহ বুলে পার হয়েছিলাম।

সন্ধ্যায় ফিরে বেইস ক্যাম্প'এ শেষ ক্যাম্প ফায়ারে ত্বাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দিলেন পুরো আয়োজনের দলনেতা। সার্বিক প্রশিক্ষণশেষে তিনি আমাদের পরদিন থেকে একটি রক্ষ কঠিন যাত্রা কামনা করে আমাদের বিদায় দিলেন। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সবাই বেশ পুলকিত আগামীকালের কথা ভেবে।

সকালে নাস্তা খেয়ে এবং দুপুরের খাবার রুকস্যাকে ভরে বাড়তি সব জিনিষ আর টাকাকড়ি বেইস ক্যাম্প'এ জমা দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের প্রথমদিনের গন্তব্য গ্রহণ নামের একটি পাহাড়ি গ্রাম। গ্রহণ প্রায় ৮০০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত। হাটা শুরুর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই হাটার দ্রুততা অনুসারে সবাই নিজ নিজ পছন্দের ছোট ছোট দলে আলাদা হয়ে গেল। প্রকৃতি তাঁর সব সৌন্দর্যের যেন পসরা সাজিয়ে বসেছে। পথ হারাবার কোন ভয় নেই কারণ আমাদের উপরে উঠে যেতে হচ্ছিল একটি পাহাড়ি খড়স্রোতা নালায় পাশ দিয়ে। আমি হাটছিলাম ফরেস্ট অফিসার রেডিড'র সাথে, বেশ মুগ্ধভাবেই শুনছিলাম তাঁর কথা। তিনি জঙ্গল সম্পর্কে বিভিন্ন মজার তথ্য দিচ্ছিলেন। এই পুরো এলাকাটা আসলে বন বিভাগের সম্পত্তি, এটি একটি ভার্জিন রেইন ফরেস্ট। এখানের সবচেয়ে বয়স্ক গাছের বয়স সর্বোচ্চ ৫০০ বছর কিন্তু মজার ব্যাপার হলো গ্রহণ গ্রামের বয়স ৮০০ বছর।



রেডিড আবার পাখি প্রেমিক, ডাক শুনে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন বিভিন্ন পাখির

সাথে মৃত শুকনো গাছ পাখির বাসা বানাবার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেকথাও বলছিলেন। তিনি আমাকে গাছ লক্ষ্য করতে বললেন, পাহাড়ের উচ্চতা বারার সাথে সাথে নাকি গাছের ধরন বদলে যাবে আর একি প্রজাতির গাছ হলে তার ডাল নিচু হবে উপরে কারণ তাদের তুষারের ভর বইতে হয় উপরে। হঠাৎ একটি পাহাড়ি ক্ষীণ জলের ধারা দেখিয়ে বললেন পান করতে। এই পানি নাকি আসল মিনারেল ওয়াটার যেখানে সব মিনারেল বিদ্যমান। পান করে আসলেই বেশ স্বাদু মনে হলো।

প্রকৃতির রূপ এতোই মোহনীয় যে জায়গায় জায়গায় আমি থমকে যাচ্ছি বিভিন্ন স্থানে। সৌন্দর্য একধরনের শ্রদ্ধা জাগায় মনে, অজান্তেই মাথার টুপি খুলে হাতে চলে আসছে। দুপুর বেলায় আমরা একত্রিত হলাম খাবারের জন্য। যার যার টিফিন বাক্সের খাবার খেয়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা শুরু। প্রথমদিনেই আমরা বুঝে গেলাম কে দ্রুত ট্র্যাকার আর কে ধীর ট্র্যাকার। ছবি নেবার জন্য বা সৌন্দর্য দেখবার জন্য থামলেও আমি একদম প্রথম কাতারের দ্রুত ট্রেকার। আমার সাথে আছে বাবু ভাই। বাবু ভাই'কে নিয়ে প্রায় দিন'ই আমি সবচেয়ে আগে গন্তব্যে পৌঁচেছি। প্রসংক্রমে উৎসাহীদের বলে রাখি যে দ্রুত পাহারে ওঠা আসলে চরম বোকামি, সবারই বেশি উচ্চতায় ধীর গতিতে ওঠা উচিত।

বিকালবেলা গ্রহণ গ্রামের অদূরে ক্যাম্প করা হলো। ক্যাম্পে সবকিছু গুছিয়ে আমরা কয়েকজন গ্রাম দেখতে বের হলাম। গ্রহণে'র সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ হচ্ছেন গ্রামের ছোট্ট স্কুলের একমাত্র শিক্ষক ভবানীজী। তিনি একজন পুরোদস্তুর কবি, সত্যতা থেকে দূরে থেকে সবার অলখ্যে কাব্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের পেয়ে তিনি তাঁর কবিতার খাতা খুলে বসলেন। হিন্দিতে লেখা চমৎকার সব কবিতা শুনে ফিরে ক্যাম্প ফায়ার করলাম। গ্রহণে'র একজন প্রবীণ ভেষজ চিকিৎসক'কে আমরা আমন্ত্রন করেছিলাম রাতের খাবারের পরে একটা 'আফটার স্পিচ ডিনারের' জন্য, তিনি খুব চমৎকার সব ধ্বনন্তরী লতাপাতার গুনাগুন বর্ণনা করে আমাদের কাছে কিছু প্যাপিরাস পাতা, পাথুরে স্ফটিক ইত্যাদি বিক্রি করলেন।

অনেকেরই বোধহয় ধারণা নেই যে জনমানবহীন বিস্তীর্ণ এলাকায় কোন শৌচাগার থাকে না। সব কাজ'ই সারতে হয় খোলা আকাশের নিচে এবং ব্যবহারের পর সব অচ্ছূত কাগজ সাথে নিয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হয়। পর্বতে এসব কিছুই ভীষণ অস্বস্তিদায়ক কারণ কোন চুড়ায় বা খোলা জায়গায় ক্যাম্প করা হলে নিচে কোন আড়াল পাওয়া সম্ভব হয় না। আমরা দলের মেয়েদের একটা সীমানা দিয়ে দেই এসবের জন্য যাতে নারীপুরুষ পরস্পরকে বিরতকর অবস্থায় মুখোমুখি না হতে হয়। বাংলাদেশ'এর বান্দরবানে কমবেশি প্রায় সব ট্রেকারেরই সকালে অসহায় অবস্থায় অতি উৎসাহি এবং বেপরোয়া শুকরের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা রয়েছে। গ্রহণের ক্যাম্পেও তেমনি একটা অভিজ্ঞতা হলো। সেকথা বিস্তারিত বলা খুব শোভন ব্যাপার নয়, তবে উদ্ধারকারী হিসাবে আবির্ভাব হলো বাবুভাই এবং তাড়া করে তাবৎ উৎসাহি শুকড়কুল'কে দূরে সরিয়ে রাখল।

পরবর্তী দিন সব প্রস্তুতি নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। আমরা ক্রমান্বয়ে উপরে উঠছি। দুঃখজনকভাবে এতদিন পরে অনেক ট্রেইলের নাম'ই মনে পরছে না, তবে দ্বিতীয়দিনের ক্যাম্পটির অপর নাম ভারতীয় সুইজারল্যান্ড। কয়েকবছর পরে সুইজারল্যান্ডে ক্লাইম্বিং করতে যেয়ে বুঝেছিলাম সেটা মোটেই অতিরঞ্জন করে বলা হয়নি। বিকালে ক্যাম্প করে আমরা খো খো খেলায় মেতে উঠলাম। তুলনামূলক বয়স্কদের খেলার শক্তি বা ইচ্ছা প্রথমে না থাকলেও পরে খেলা জমে ওঠায় অনেকেই যোগ দিলেন। সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফায়ারে আমরা সবাই গান, আবৃত্তি কৌতুক, শের, ধাঁধা, বাঁশি এবং মাউথ অর্গান বাজিয়ে অংশগ্রহণ করলাম।

পরদিন হাটছিলাম নাগপুরের তরুন মনোচিকিৎসক সাউজি'র সাথে। মনোবিজ্ঞান নিয়ে আমার যাবতীয় সমস্যা এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন তিনি শেষদিন পর্যন্ত। সাউজি আমার চিন্তা অনেক পরিপূর্ণ করেছেন। তাঁর সাথে যোগাযোগের পর থেকেই যেন জীবন সম্পর্কে নতুন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি

তৈরি হয়।

প্রায় সন্ধ্যায় ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি মনোহর এক দৃশ্য; বেশ কয়েকশ পাহাড়ি ছাগল নিয়ে রবিনসন ক্রুশো'র মতো হাতে তৈরি চামড়ার কোট পরে বন্দুক কাধে এক মেমপালক চলার পথে আমাদের তাবুর কাছে রাত্রি যাপন করছেন। সব ছাগলদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখছে তার দুই লোমশ হিমালয়-কুকুর। দুই কুকুরের একটিকে আদর করতে যেতেই দাঁতমুখ খিঁচে তেড়ে এসে যেন বুঝিয়ে দিলো সে ড্রাইংরুমের কার্পেট ডগ নয়, অনেকবেশি বাস্তববাদী, তাঁকে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়।

রাতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পরেছি হঠাৎ সেই কুকুরদ্বয় এবং বাবুভাই'এর তীব্র চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাবুর ফাঁক দিয়ে টর্চের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম দুটি কালো বিশাল হিমালয়-ভাল্লুক কোনকিছু পরোয়া না করেই মুখে একটি সদ্যমৃত ছাগল নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে সারারাত ঠিকমতো ঘুম এলো না। ভোররাতে চুপি চুপি সেই মেমপালক আমাদের ভাল্লুকের শিকার এক হতভাগ্য ছাগলের পোড়ান মাংস খেতে আমন্ত্রণ জানাল। পুরো যাত্রাপথে আমাদের আমিষের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমরা আমিষভোজী কয়েকজন সেই নিষিদ্ধ আহ্বান'এ সাড়া দিলাম কালবিলম্ব না করে। কুকুর, বানর, সাপ, অস্ট্রোপাস কতকিছু চেখে দেখেছি, ভাল্লুকের শিকার করা ছাগলতো সেই তুলনায় অমৃত!

আমাদের ট্রেইল দিন দিন খাড়া হচ্ছে। প্রায়ই আমাদের দড়ির মই বেয়ে রীতিমত খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হচ্ছে। দলের একজনের ডাইরিয়া হয়েছে, সঙ্গে থাকা অমুখে কাজ না হওয়ায় তাঁকে ফেরৎ পাঠান জরুরি হয়ে পড়ল। অনেকেরই শরিরে আর কুলোচ্ছে না। এক মহিলা কান্নাকাটি শুরু করায় তাঁর রুকস্যাক আমি আমার পিঠে নিলাম যা আমাকে শেষদিন পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে। আশ্চর্য, তাঁর স্বামী একবার'ও স্ত্রী'র রুকস্যাক বহন করতে চাইলেন না, এমনই কঠিন প্রেম তাঁদের! আমরা ক্যাম্প করার পর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে ধীরে ধীরে আসেন চাঁন সাহেব। আমরা অনেকেই তাঁর রুকস্যাক বহন করতে চেয়েছি কিন্তু তিনি সোজা বলেছেন যেদিন থেকে নিজের ব্যাগ বহন করতে পারবেন না সেদিন থেকে আর ট্র্যাকিং'এ আসবেন না। এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডাতেও চাঁন সাহেব জামাকাপের খুলে বরফশীতল পানিতে গোসল করেন, দেখে আমাদের'ই উলটো গা শিউরে ওঠে।

সন্ধ্যায় এক পাহাড়ের গোড়ায় ক্যাম্প করে অদূরেই প্রথমবারের মত জমাট বরফ দেখে তখনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল। ক্যাম্পে সব গুছিয়ে সবাই মিলে অনেকক্ষন বরফ ছোড়াছুড়ি খেললাম। কয়েকজন মিলে একজন'কে বরফে নাকানি চোবানি খাওয়ানোতে ভীষণ আনন্দ। হায়, কে জানত যে কিছুদিনের মধ্যেই বরফে সবার অরণি ধরে যাবে!

পরদিন থেকে আমরা প্রায় ভোররাতে যাত্রা শুরু করলাম। বরফ গলার আগেই কিছু বিপদজনক জায়গা পার হতে হয় প্রায় প্রতিদিন। বরফের এলাকা শুরু হতে চলার গতি কিছুটা ধীর হয়ে গেল। আমাদের পাহাড়ি গাইড সবার সামনে বরফ-কুঠারের ছঁচালো দিক বরফে চেপে গর্ত পরিষ্কা করে নিচ্ছে আর তাঁর পেছনে লাইন ধরে আমরা সবাই। মাঝে মধ্যেই হিমালয় ভাল্লুকের পায়ের ছাপ চখে পরছে। এখন আমাদের খাবার পানিও বেশিরভাগ সময়'ই বরফ গলিয়ে নিতে হচ্ছে। রাতে ক্যাম্প করার পর ভোরবেলা উঠে তাবু আর চেনা যায় না বরফের আস্তরণে। সারাদিনের ক্লান্তির পর ক্যাম্প করে খুব হৈ চৈ করি। 'আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল' গানটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে গেছে, মাথায় গামছা বেঁধে আমি বেসুরো গলায় গান গাই আর সবাই থালাবাসন, মগ, চামচ বাজিয়ে সাথে গলা মেলায়। আমাদের পাহাড়ি গাইড না জানা ভাষায় অদ্ভুত চমৎকার সব গান করে। ছেলেরা এবং মেয়েরা দুই দল করে গানের প্রতিযোগিতা করি যা প্রায় সবসময়'ই ঝগড়া দিয়ে শেষ হয়।

ইতিমধ্যে দু'একজনের উচ্চতাজনিত রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অনেকেরই মেজাজ তুচ্ছ

कारणे खाराप हये याय। माटिर् मानुष आमादेर् शान्तु सुलशिक्षक दलनेता पर्यन्तु एकदिन तुच्छ कारणे विरिञ्जिकर् मानुष कुकरेजा साहेबेर् उपर स्फेपे गेलेन या आमादेर् समुह आनन्द दियेछे। आरेकदिन मुम्बाई'एर् मेये विदिया तर्के रेगे गिये अपर एक मेयेके वरफ कुठार निये आक्रमन करे वसल, सवार चिंकारे आमरा दौडे एसे विदियाके शान्तु करि। सेदिन वडु कोन दुर्घटना घटे येते पारत।

एकटा एकटा करे दिन केटे याछे वरफराजे। सबचेये सूरणिय दिन अपेक्षा करहिल नागारु पर्वतेर् चुडाय क्यम्प करार दिन। आमरा क्यम्प करेछि प्राय १७००० फिट उँचु पर्वतेर् चुडाते खुव ह्येउँ समतल जायगाय। अडुत आवहाओया एखाने, एई ढडु, एई तुषारपात आवार परम्फनेई रोद। आवहाओयार प्रचलीत कोन नियमई एखाने प्रयोय नय। आमादेर् ताबुर पेछनेई खाडा नेमे गेछे पर्वत। केउ घुमेर् घोरे पा फसके गेले फिरे आसार सन्तवना प्राय नेई बललेई चले। उदयोगी हये आमरा दडि दिये एकटि प्राचीर् टेने दिलांम सेई विपदजनक सीमानाय। राते ताडाताडि खेये सुये पडेछि। आज पाला करे आमादेर् चारजनेर् ताबुर ओपरेर् तुषार परिस्कार करार कथा, नयत तुषारेर् भारे ताबु भेजे परते पारे। वाकि सवार सकालेर् आगे वेर् हओया वारन। आमि बेश कयेकवार वरफ परिस्कार करते वाईरे एसेछि, साथे साथेई हात, पा, नाक, कान सब जमे याय ठाडाय। अल्प किछुफनेर् मध्येई तीषण ढडु शुरु हलो, वाईरे वेरुलेई मने हछे वातास एवंग तुषार आमाके उडिडे वा ठेले ये कोन उपाये एकटि प्रांते नेवार चेष्टा करेछे। आमादेर् ताबुर मावेर् खुँटि चारजन सारारात धरे चेपे धरे आछे कारण ताबुर खुँटि भेजे यावार मत विपद ढडेर् मध्ये आर किछु हते पारे ना। एकसमसय सब आशक्षा सति्य करे मेयेदेर् ताबुर खुँटि भेजे पडल। चारिदिके चिंकार, कान्ना आर ढडेर् गर्जन। आमरा कयेकजन वेरिये किछुफन सेई ताबु धरे राखलाम आर एई समये मेयेरा जिनिषपत्र निये वाकि दुटो ताबुते भाग करे उँठल। कान्ना आर चिंकारेर् मध्येई धीरे धीरे एकसमय ढडु कमे आसल।

दिनेर् आलो फुटे उँठते देखि सब शान्तु, आमादेर् दुजन खुँटि चेपे धरेई घुमिये परेछे। आमादेर् गाईड बललेन गतरातेर् ढडे आमरा सौभाग्यक्रमे दलीय प्रचेष्टाय अस्फुत आछि। सवार चोखेमुखे आज अन्यरकम एकटा रेश, सवार मुखेई गतरातेर् सन्भाव्य विपदेर् कथा।

दीर्घपथ पारि दिये एर् दुदिन परेई आमरा लोकालये नेमे आसि। ओठार चेये नेमे आसते अनेक कम समय लागे। वेईस क्यम्प एखाने थेके आर मात्र २५ किलोमिटांर। माटिर् रास्ताय दिने एकटि वास याय मनिकरण'ए। आमरा सिद्धान्तु निलांम वासे याओयार। हिमालयेर् सेई आँकावाका वस्त्रु पथे वासेर् छादेर् भ्रमनटाओ कम वैचित्रमय छिलो ना।

मनिकरण आसले एकटि उँष प्रस्रवन। एखानेर् सालफार मिश्रित पानि सबसमय'ई फुटछे एवंग चोख ज्वाला करा वास्प बलके उँठछे। कापडेर् व्यागे चाल वेधे दडिते बुलिये एई पानिते डोबाले ४ मिनिटे भात हये याय, यदिओ सेई सालफारजुंक्तु भात खाओया वारन। किंवदन्ति आछे एकवार शिव तार स्त्री पार्वतीके निये वाहन नन्दीर् पिठे करे नदी पार हछिलेन। एकसमय पार्वतीर् नाकफुल वा मनि असावधानवशत नदीते पडे याय। पार्वती जलेर् देवतार काछे सेई मनि फेरंग चाँले तिनि ता दिते अस्वीकार करेन। शिव तखन स्फेपे गिये सेखाने तीषण तपस्या शुरु करेन। एई तपस्या सह्य ना करते पेरे नदी आणुनेर् मतो गरम हये ओठे एवंग शेष पर्यन्तु नदी सेई मनि उगरे देय पार्वतीर् काछे। एखाने पृथिवीर् एकमात्र ब्रह्मांमन्दिर एवंग शिख धर्मेर् अति पवित्र गुरु दुयारा अवस्थित। मन्दिरेर् तीषण गरम पाथरेर् मेवेते दाडाले मने हय येन फुत्तु आग्नेयगिरिर् ओपर दाडिये आछि। मनिकरणेर् विशेष पानिते टिकिट केटे गौसलखानाय गौसल करार व्यवस्था आछे। एतदिन परे प्रथमवारेर् मतो आयनाय निजेके देखे चमके उँठलाम। एटा कि सति्य आमि! सारामुखे रोदे फोक्का, गाये अनेकदिन गौसल ना करा मयलार आस्रन, मुखे खोचा खोचा दाडिगोफ....

বিকালে বেইস ক্যাম্প'এ ফেরার পরে সেখানের লোকজন আমাদের ফুল দিয়ে বরন করে নিলো। আমাদের ঝড়ে পড়ার খবর পৌঁচে গেছে এখানে, তাই এই বিশেষ অভ্যর্থনা। আয়োজনের দলনেতাকে বললাম তিনি রক্ষ কঠিন যাত্রা কামনা করে কি বুঝিয়েছিলেন তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। রাতে শেষ ক্যাম্প ফায়ারে আমরা বাকিদের আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। চাঁন সাহেবকে সম্বর্ধনা দেয়া হলো। বাবুভাই'এর জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা ছিলো সেদিন। সবশেষে আমাদের সমবেত 'টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল' দিয়ে ক্যাম্প ফায়ার শেষ হলো। সবাই বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব, শুধুমাত্র আমরা কয়েকজন ছাড়া। আমরা আগামীকাল সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে পরশু রোটাং পাস'এ রওনা দেব। তারপরে আরো কিছু জায়গা ঘুরে আমার দেশে ফিরে যাবার পরিকল্পনা।

পরদিন দুপুরে ক্যাম্প ত্যাগের সময় দেখি অন্ধ্র প্রদেশের সদ্যতরুণ ছোটকু'র চোখে পানি। ভাবলাম কার সাথে হয়ত ঝগড়া হয়েছে। ওকে দুষ্টুমি করে পেটে ঘুষি দেয়াতে সে আমাকে ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল। তখন বুঝলাম যে একসাথে এতদিন থেকে এখন বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্টেই তার এই কান্না। আমাদের সবার মন'ই বিষন্ন। আবার কবে মা হিমালয়ের বুকে আসব সেই কথা ভাবতে ভাবতেই রুকস্যাক কাধে আবারো পথে নামলাম।